তিস্তা মহাপরিকল্পনা: মরণোত্তর অববাহিকার জীবনরেখা ও ভূ-রাজনৈতিক সমীকরণ

দক্ষিণ এশিয়ার হাইড্রো-পলিটিক্স বা জলকূটনীতির এক চরম ট্র্যাজেডির নাম তিস্তা নদী। সিকিমের হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়ে পশ্চিমবঙ্গ দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করা এই আন্তর্জাতিক নদীটি আজ এক চরম অস্তিত্ব সংকটে। উজানের একতরফা পানি নিয়ন্ত্রণ এবং ভাটির দেশের অববাহিকার মরুকরণ এই দুই বাস্তবতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প তিস্তা ব্যারেজ (ডালিয়া পয়েন্ট)। এককালে যে নদীটি উত্তরবঙ্গের জীবন ও অর্থনীতিকে সচল রাখত, তা আজ আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক সমীকরণের মারপ্যাঁচে পড়ে মরণোত্তর অববাহিকায় রূপান্তরিত হয়েছে। তবে আশার কথা হচ্ছে, দীর্ঘদিনের কূটনৈতিক স্থবিরতা কাটিয়ে বর্তমান বাংলাদেশ সরকার এই মরণোত্তর অববাহিকাকে পুনরুজ্জীবিত করতে চীনের সাথে যৌথ বিনিয়োগে ‘তিস্তা মহাপরিকল্পনা’ বা ‘কম্প্রিহেনসিভ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রেস্টোরেশন অব তিস্তা রিভার প্রজেক্ট (TRCMRP)’ বাস্তবায়নের চূড়ান্ত রূপরেখা ঘোষণা করেছে। ফলে তিস্তা ব্যারেজ এখন কেবল একটি কংক্রিটের পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নয়, এটি উত্তরবঙ্গের ৩ কোটি মানুষের বেঁচে থাকার শেষ জীবনরেখা এবং ঢাকা-দিল্লি-বেইজিং ত্রিমুখী ভূ-রাজনৈতিক দাবার প্রধান ঘুঁটি।

সিকিমের জেমু হিমবাহ থেকে উৎপন্ন ৪১৪ কিলোমিটার দীর্ঘ নদীর ১২১ কিলোমিটার বাংলাদেশে অবস্থিত। মোট অববাহিকা প্রায় ১২,১৫৯ বর্গ কিলোমিটার, যার একটি বিশাল অর্থনৈতিক প্রভাব অঞ্চল বাংলাদেশে অবস্থিত। ১৯৯০ সালে লালমনিরহাটের হাতিবান্ধায়

নির্মিত ডালিয়া ব্যারেজটির লক্ষ্য ছিল খরাপ্রবণ ৫ লাখ ৪০ হাজার হেক্টর জমিতে সেচ দেওয়া। কিন্তু, ১৯৮৫ সালে লিংক ক্যানেলের মাধ্যমে মহানন্দা অববাহিকায় ভারত তৈরি করে

গজলডোবা ব্যারেজ যা পানি সরিয়ে নেয়ার জন্য ভারতের তৈরি একটি প্রতিবন্ধক হিসেবেই বিবেচিত।

শুষ্ক মৌসুমের স্বাভাবিক সময়ে যেখানে বাংলাদেশের প্রয়োজন প্রায় ৫,০০০ থেকে ১০,০০০ কিউসেক পানি, সেখানে ডালিয়া পয়েন্টে পানি প্রাপ্তি অনেক সময় মাত্র ৩০০ থেকে ৪৫০ কিউসেকে নেমে আসে।

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলকে বলা হয় দেশের অন্যতম শস্যভাণ্ডার। এই অঞ্চলের খাদ্য নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক টেকসই প্রায় সরাসরি তিস্তা মহাপরিকল্পনার কার্যকারিতার উপর নির্ভর করছে। তবে তীব্র পানি সংকটে এই জীবনরেখা আজ অনেকটাই অস্তিত্ব সংকটে নিমজ্জিত। তিস্তা সেচ প্রকল্পের (TIP) কমান্ড

এলাকায় লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ১০% জমিতেও শুষ্ক মৌসুমে সেচ দেওয়া সম্ভব হয় না। ফলে বরেন্দ্র অঞ্চলে বোরো ও আমন চাষ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে যা দেশের সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তার জন্য একটি বড় ধাক্কা।

তিস্তায় পানি না থাকায় উত্তরাঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর প্রতি বছর আশঙ্কাজনকভাবে নিচে নেমে যাচ্ছে।

সমগ্র অববাহিকায় স্পষ্ট হয়ে উঠছে মরুকরণের প্রাথমিক লক্ষণ। যা জাতিসংঘের এসডিজি-১৫ (SDG 15: Life on Land) অর্জনের পরিপন্থী।

আকস্মিক বন্যা ও নদীভাঙনের দ্বিমুখী আঘাতের কথা বললে দেখা যাবে এখানে রয়েছে বৈষম্যের এক অন্যায্য খেলা। শুষ্ক মৌসুমে যেখানে মিলে না এক ফোঁটা পানি, বর্ষাকালে সেখানে উজান থেকে গজলডোবার সব গেট একসঙ্গে খুলে দেওয়া হয়।

রিভারাইন পিপলের গবেষণা অনুযায়ী, প্রতি বছর তিস্তার ভাঙন ও প্লাবনে উত্তরের ৫ জেলার বাসিন্দারা প্রায় ১ লাখ কোটি টাকারও বেশি আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন।

সরকারের নতুন উদ্যোগের অংশ হিসেবে তিস্তা মহাপরিকল্পনা বিষয়টিতে আলোকপাত করলে দেখা যায় যে, এর বাস্তবায়নে রয়েছে নানামুখী চ্যালেঞ্জ। কূটনৈতিক টেবিলে ভারতের দীর্ঘসূত্রতার কারণে বাংলাদেশ সরকার নিজস্ব সার্বভৌম জলনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চীনের সাথে যৌথ অংশীদারিত্বে নতুন করে এই মহাপরিকল্পনা এগিয়ে নিচ্ছে। ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (BWDB) চীনা রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান 'পাওয়ার চায়না' (POWERCHINA)-র সাথে এই চুক্তি নবায়ন করেছে এবং পরিবেশ ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ঘোষণা অনুযায়ী - ২০২৬ সাল থেকে মাঠ পর্যায়ে এর নির্মাণ কাজ শুরু হতে যাচ্ছে। প্রায় ১০ বছর মেয়াদী এই মেগা প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ১২,০০০ কোটি টাকা (১ বিলিয়ন ডলার)।

তিস্তা মহাপরিকল্পনার প্রধান কারিগরি দিকসমূহের মধ্যে রয়েছে - নদী খনন ও গভীরতা বৃদ্ধি করা, তীররক্ষা ও বাঁধ নির্মাণ, বিশাল জলাধার নির্মাণ এবং ভূমি পুনরুদ্ধার ও আধুনিকায়ন।

তিস্তা মহাপরিকল্পনা কেবল একটি নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প নয়, এটি দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম প্রধান ভূ-কৌশলগত ফ্ল্যাশপয়েন্ট।

তিস্তা অববাহিকাটি ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর লাইফলাইন তথা ভারতের ভূ-কৌশলগতভাবে অত্যন্ত সংবেদনশীল শিলিগুড়ি করিডোর এর খুব কাছাকাছি অবস্থিত।

ভারত তার নিরাপত্তার স্বার্থে বাংলাদেশের এই কৌশলগত অঞ্চলে চীনের প্রকৌশলী ও প্রযুক্তির দীর্ঘমেয়াদি উপস্থিতি কখনোই দেখতে চায় না। তাই তারা বিগত সরকারের আমলে নিজে থেকেই এই প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছিল এবং চীনের প্রবেশ ঠেকাতে চেয়েছিল। কিন্তু, ২০২৪ সালের আগস্টে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর দায়িত্ব নেয়া অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বাংলাদেশের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে চীনের সাথে চুক্তিটি পুনরুজ্জীবিত করেছে, যা দিল্লির নীতি নির্ধারকদের মধ্যে ব্যাপক কৌশলগত উদ্বেগ তৈরি করেছে।

ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ১৯৯৬ সালের ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গা পানি বন্টন চুক্তির মেয়াদ ২০২৬ সালের ডিসেম্বরে শেষ হতে যাচ্ছে। এই সময়সীমার ঠিক আগমুহূর্তে চীনের সহায়তায় তিস্তা প্রকল্পের কাজ শুরুর বিষয়টি বাংলাদেশের জন্য ভারতের সাথে গঙ্গা চুক্তি নবায়নের দরকষাকষিতে একটি বড় ‘কূটনৈতিক লিভারেজ’ হিসেবে কাজ করবে।

আন্তর্জাতিক আইন ও বাংলাদেশের ন্যায্য অধিকারের দিকটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আন্তর্জাতিক পানি আইন বা ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার ল অনুযায়ী ভাটির দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত।

জাতিসংঘ জলপ্রবাহ কনভেনশন ১৯৯৭ এর আর্টিকেল ৫ ও ৭ অনুযায়ী, উজানের দেশ

কোনো আন্তর্জাতিক নদীর পানি এমনভাবে ব্যবহার করতে পারে না যা ভাটির দেশের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি করে।

হেলসিংকি রুলস ১৯৬৬ অনুযায়ী অববাহিকাভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্র সমতা ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে (Equitable and Reasonable Utilization) পানি ব্যবহারের অধিকারী। ভারত আন্তর্জাতিক ফোরামে পরিবেশ ও টেকসই উন্নয়নের কথা বললেও তিস্তার ক্ষেত্রে এই নীতিগুলোর যথাযথ প্রয়োগ ঘটাচ্ছে না।

তিস্তা মহাপরিকল্পনা শুরু হলেও দীর্ঘমেয়াদি পানিশূন্যতা দূর করতে হলে বাংলাদেশকে একটি বহুমাত্রিক রোডম্যাপ নিয়ে এগোতে হবে। স্মার্ট ভূ-রাজনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখার নিরিখে চীনকে দিয়ে অভ্যন্তরীণ নদী শাসন করানোর পাশাপাশি ভারতের সাথে ২০২৬ সালের গঙ্গা চুক্তি নবায়নের টেবিলে তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ের চাপ অব্যাহত রাখতে হবে। তিস্তা নদীর স্থায়ী সমাধান শুধু দ্বিপাক্ষিক সীমারেখায় সম্ভব নয়। উৎস দেশ চীন (তিব্বত), নেপাল এবং ভারতকে যুক্ত করে একটি বহুপাক্ষিক আঞ্চলিক নদী কমিশন গঠন করতে হবে।

তিস্তা মহাপরিকল্পনা কেবলমাত্র কংক্রিটের একটি কাঠামো নয়, এটি উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক মানচিত্রের হৃদপিণ্ড। ভূ-রাজনীতির জটিল সমীকরণে পড়ে একটি জীবন্ত নদীকে 'মরণোত্তর অববাহিকা' পরিণত করার আত্মঘাতী খেলা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।

বাংলাদেশ সরকারের সাম্প্রতিক তিস্তা মহাপরিকল্পনা গ্রহণের সাহসী পদক্ষেপ উত্তরবঙ্গের কোটি মানুষের মনে নতুন করে বাঁচার আশা জাগিয়েছে। ভারত যদি তার 'নেইবারহুড ফার্স্ট' নীতিতে অটল

থাকতে চায়, তবে বাংলাদেশের এই পানি নিরাপত্তার অধিকারকে সম্মান জানাতে হবে। নিজস্ব শক্তি ও আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বের সঠিক মিশ্রণে বাংলাদেশ যদি এই মহাপরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে পারে, তবে তিস্তার অবরুদ্ধ নিয়তি বদলে গিয়ে ধমনীতে ফিরবে টেকসই ও সমৃদ্ধ এক নতুন আখ্যান।